টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

পলিসি ব্রিফ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬:

দুর্নীতি ও ঘুষ হ্রাস করার ওপর বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৫৭

নভেম্বর ২০১৭

প্রেক্ষাপট

'এজেন্ডা ২০৩০' বা এসডিজি'র মোট ১৭টি বৈশ্বিক অভীষ্টের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট হচ্ছে এসডিজি ১৬, যেখানে 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ' করার কথা বলা হয়েছে। এসডিজি'র অন্যান্য অভীষ্ট অর্জনের জন্যও এই অভীষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য ১২টি, এবং সূচক ২৩টি।

এসডিজি ১৬ অর্জনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যগুলোর ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সম্প্রতি একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এই পলিসি ব্রিফ এসডিজি ১৬'র একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ১৬.৫, বিশেষকরে সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য হারে কমানোর লক্ষ্য অর্জনে আইনি ও কাঠামোগত প্রস্তুতি, বাস্তব পরিস্থিতি, এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করছে।

লক্ষ্য ১৬.৫

"সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা"।

প্রস্তুতি

বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী আইনের মধ্যে দণ্ডবিধি, ১৮৬০, ফৌজদারি কার্যবিধি আইন, ১৮৯৮, দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৯, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১, এবং অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ উল্লেখযোগ্য। জাতীয় বিভিন্ন কৌশলপত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধের অঙ্গীকার করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে রূপকল্প ২০২১, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২, এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)। এছাড়া বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে স্বাক্ষর, অনুসমর্থন করেছে ও পরবর্তীতে তা বাস্তবায়নে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে।

উপরোক্ত আইন প্রয়োগের জন্য দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান, যার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ, এবং কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয় (ওসিএজি)। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য দুদক ও বিচার বিভাগের মতো প্রতিষ্ঠানের আইনি স্বাধীনতা, মর্যাদা, আইনগত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নির্ধারিত। এছাড়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাংলাদেশ ব্যাংক, নির্বাচন কমিশন, এবং তথ্য কমিশন সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীরা বেসরকারি অংশীজন হিসেবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দুদকের দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ, শনাক্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বিদ্যমান দুর্নীতিবিরোধী আইনগুলোতে দুর্নীতি সংক্রান্ত কার্যক্রম সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান বর্ণিত হয়েছে। এসব আইনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের সততা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা; উপহার, সুবিধা, এবং বন্ধুত্ব; স্বজনপ্রীতি, কর্তৃত্বের অপব্যবহার, স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক (আরপিও), এবং এটি সাধারণ জনগণের কাছে সহজলভ্য। লাভজনক কোনো প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করলে সংসদ সদস্যপদ বাতিল হওয়ার কথা। একইভাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেখানে ক্ষমতা/ প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে বিনিয়োগ করা; সরকারি কর্মচারীদের আওতার মধ্যে পড়ে এমন ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হওয়া সরকারি কর্মচারীদের জন্য নিষিদ্ধ। তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। সরকারি কর্মচারীদের প্রতিবছর শেষে সম্পদের বিবরণী ঘোষণা করতে হবে, এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব অমান্য করলে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্নীতির বিষয়ে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদান ও তার গোপনীয়তা রক্ষার জন্যও আইন প্রণীত হয়েছে। এছাড়া সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬-এ ক্রয়ের সর্বোচ্চ সীমা, ক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ, এবং স্বপ্রণোদিতভাবে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

বাস্তবতা

তবে যথেষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সত্ত্বেও বাংলাদেশে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত ও প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে খানা পর্যায়ে কী পরিমাণ ঘুষ ও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয় তা নিয়ে টিআইবি'র দেশব্যাপী পরিচালিত খানা জরিপে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার উচ্চ বলে দেখা যায়। সর্বশেষ খানা জরিপে (২০১৫) দেখা গেছে জরিপকৃত খানার ৬৭.৮% দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যেখানে সেবা পেতে ৫৮.১% খানা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে।

দুর্নীতি ও ঘুষ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকেও বাংলাদেশের স্কোর ও অবস্থান নিম্ন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) ২০১৬ সালের দুর্নীতির ধারণাসূচকে (শূন্য থেকে ১০০ স্কেলে) বাংলাদেশের পয়েন্ট ২৬, এবং ১৭৬টি দেশের মধ্যে ১৪৫তম ছিল। বিশ্ব ব্যাংক-এর ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ১০০ এর মধ্যে ১৮.৮। গ্লোবাল কমপিটিটিভনেস র‍্যাংকিং ২০১৪ অনুসারে অবৈধ অর্থ প্রদান ও ঘুষের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ২.৩ (৭ এর মধ্যে), এবং অবস্থান ১৪৪টি দেশের মধ্যে ১৪০তম। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম-এর ২০১৬'র তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের দুর্নীতির প্রাক্কলিত অর্থমূল্য জিডিপি'র ৫ শতাংশ।

বাংলাদেশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়। অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত করার হার কম, এবং সার্বিকভাবে দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তির হারও কম। এছাড়া দুর্নীতির তদন্ত ও মামলা পরিচালনায় দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং অন্যান্য বছরের তুলনায় ২০১৭ সালে দুর্নীতির মামলায় শাস্তির হার বেড়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মধ্যে দুদক প্রতিষ্ঠান ও এলাকাভিত্তিক গণশুনানি আয়োজন শুরু করেছে ২০১৫ সাল থেকে। এছাড়া নির্বাচিত ২৫টি খাত ও প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক উদ্যোগ নিয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর জন্য সম্প্রতি হটলাইন চালু করেছে।

চ্যালেঞ্জ

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু আইনি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয় - বিদ্যমান আইনে কয়েকটি বিভাগের কর্মচারীদের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত প্রদত্ত বিবরণ প্রকাশ করতে সরকারি কর্মচারীরা বাধ্য নন। সরকারি কর্মচারীদের জন্য অবসর গ্রহণের পর একই খাতের বেসরকারি কোনো চাকরিতে যোগদানের পূর্বে কতদিন ব্যবধান থাকতে হবে সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর সংসদ সদস্যরা তাদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য নন। বাংলাদেশে 'লবিইং' সংক্রান্ত কোনো আইন বা নীতি নেই। গোপন তথ্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য আইন ও নীতিমালায় কোনো মানদণ্ডের উল্লেখ নেই। জনস্বার্থ সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে পেশাগত বাধ্যবাধকতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, তথ্য প্রকাশকারী কোনো সমস্যায় পড়লে তার প্রতিকার, অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য স্বচ্ছ, কার্যকর ও সময়োপযোগী পদ্ধতির উল্লেখ নেই। একক উৎস থেকে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় ও চুক্তি আইনে সুস্পষ্টভাবে সর্বোচ্চ সীমার উল্লেখ নেই। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের বেনামী মালিকানার তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। এবং সরকারি ক্রয়ে গোপন আঁতাত বন্ধ করার জন্য কোনো বিধান নেই।

এছাড়া সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী সাধারণ জনগণের কাছে সহজলভ্য নয়, এবং কতজন কর্মচারী সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করে নি তাদের কোনো পরিসংখ্যান নেই। সরকারি কর্মচারীদের প্রকাশিত সম্পদের বিবরণীর কোনো অনলাইন ডেটাবেইজ নেই যার মাধ্যমে অন্যান্য সংস্থা এ তথ্য যাচাই করতে পারে। সরকারি কর্মচারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের স্বার্থ সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা, সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী যাচাই করা, তথ্য প্রকাশকারীদের নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কোনো নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নেই। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য একইরকম তথ্য প্রকাশ পদ্ধতির অনুপস্থিতি রয়েছে। এছাড়া তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব লক্ষ করা যায়, এবং এ সংক্রান্ত আইনের বাস্তবায়নও সীমিত।

সুপারিশ

আইনি সংস্কার

১. সরকারি কর্মচারীদের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, অধিকার ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য পাবলিক সার্ভিস আইন প্রণয়ন করতে হবে।

২. সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কার করে নিচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।

ক. সংসদ সদস্য ও নির্বাহী বিভাগের সদস্যদের বার্ষিক আর্থিক তথ্য প্রকাশ করা;

খ. সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের ঘোষণা জনগণের জন্য সহজলভ্য করা;

গ. প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে জনস্বার্থ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা দেওয়া;

ঘ. বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন জনগণের কাছে প্রকাশ করা।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়

৩. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি: দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক সংস্থাগুলোর জনবল কাঠামো পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল বাড়ানো, প্রেষণে নিয়োগের পরিবর্তে নিজস্ব কর্মীদের পদায়ন, এবং কর্মীদের দক্ষতা ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি: নিচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি দমনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানের (দুদক, সিএজি, বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা) জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

ক. অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য লজিস্টিক (যেমন যানবাহন, যন্ত্রপাতি, আটককৃত সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)

খ. প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম (যেমন গণশুনানি, গবেষণা ইত্যাদি)

গ. দক্ষ ও যোগ্য আইনজীবী নিয়োগ

ঘ. কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ

৫. সুরক্ষা কাঠামো: জনস্বার্থ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষার জন্য যথাযথ কাঠামো তৈরি করতে হবে।

প্রায়োগিক পর্যায়

৬. বেজলাইন জরিপ পরিচালনা: জাতীয় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে জনগণের আস্থা ও সন্তুষ্টি, ঘুষ ও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দেশব্যাপী বেজলাইন জরিপ বিবিএস-এর মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষার স্বার্থে সরকারি ও বেসরকারি বা নাগরিক সমাজ কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্তের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমন্বয় প্রয়োজন।

৭. লক্ষ্যভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন: এসডিজি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনায় এসডিজি ১৬-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সরকারকে ২০৩০ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা / মাইলফলক নির্ধারণ করা প্রয়োজন (যেমন ২০৩০ সালের মধ্যে কতটুকু দুর্নীতি ও ঘুষ কমাতে হবে, বা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট সেবাগ্রহীতাদের হার কতটুকু বাড়াতে হবে তার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা)।

৮. দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ: ব্যক্তির পরিচয় বা অবস্থান-নির্বিশেষে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত সকলের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় দৃষ্টান্তমূলক ও দৃশ্যমান শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৯. দুর্নীতির মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি: দুর্নীতির মামলার কার্যকর ও সময়ানুগ তদন্ত ও নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১০. স্বচ্ছ ক্রয় প্রক্রিয়া: সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের সব ক্রয়ের জন্য ই-প্রকিউরমেন্ট প্রচলন করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org; www. ti-bangladesh.org
www. facebook.com/TIBangladesh